শেখ হাসিনার গ্রেফতারের নেপথ্য রহস্যটি কি?

।। আজিজুর রহমান প্রিন্স ।।

বাংলাদেশে এখন রাজনৈতিক সংকট চলছে। রাজনৈতিক সংকটের কারনে বন্যা দুর্গত মানুষের সংকটও দিন দিন বেশুমার হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য এবং দুস্প্রাপ্যতায় খেটে খাওয়া মানুষের নাভিশ্বাস ওঠেছে। বিগত জোট সরকারের লুটপাট আর দুর্বৃত্তায়নের চেয়ে বর্তমান সংকটও কম নয়। বরং গুমোট অস্থিরতা ফেটে পড়ার অপেক্ষায়। রফতানি বানিজ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় খাদ্য ঘাটতিও তথৈবচ। নতুন বিনিয়োগও স্থবির। রাজনীতির নিষিদ্ধকরন আর নেতৃত্ব হননের কারনে সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থাটি ভেতরে ও বাইরে সংশয়ে আছে।

বিগত সরকারের দুঃশাসনের কারনে চৌদ্দ দলের আহবানে দেশের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। নিঃসন্দেহে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহন সে কারনে মানুষ গ্রহন করেছে স্বতঃস্ফূর্ততায়। তাদের কতিপয় পদক্ষেপও হয়েছে প্রশংসিত। কিন্তু সেই সরকারের মুখোশটি এতো তাড়াতাড়ি খসে পড়বে ধারনা করেনি কেউ। তাদের উদ্দেশ্য যে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং সুযোগ বুঝে পছন্দের লোককে ক্ষমতায় বসানো সে কথাটি ইতিমধ্যে মানুষ জেনে গেছে। এই সরকারের অধীনেও যে কোন নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না তার আলামত সুস্পষ্ট। সে কারনে তাদের পরিকল্পিত পথকে নিষ্কন্টক করতে চৌদ্দ দলের নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অপরাধীর কাতারে দাড় করিয়েছে। তাকে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষনা কোনো অমূলক বিষয় নয়। পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ডেকে নিয়ে হুমকি দেয়া হচ্ছে। যেন প্রতিপক্ষ কেবল আওয়ামী লীগ!

আওয়ামী লীগের মাঝে দুর্নীতিবাজ নেই এমন দাবি কেউ কখনও করেনি। বরং অসাধুতার কারনে শেখ হাসিনা বেশ কয়েকজন নেতাকে দল থেকে বহিস্কার করেছেন সে নজিরও আছে। এমনকি মন্ত্রীত্ব থেকেও বাদ দিয়েছেন। এই অনমনীয় শক্ত অবস্থানের কারনে দলের মাঝে তিনি সমালোচিত হয়েছেন; কিন্তু করুনা বা দয়া করেননি কাউকে। অনেক সিনিয়র নেতার সাথে এ নিয়ে ঠান্ডা লড়াই চলেছে বহুদিন। সে কারনেই শেখ হাসিনা নিজ দলে সংস্কার চেয়েছেন। একই সাথে সংস্কার চেয়েছেন নির্বাচন কমিশন ও সরকার কাঠামোর।

সদ্য বিদায়ী জোট সরকারের দুস্কর্ম, রাষ্ট্রীয় লুট-তরাজ এবং নৈরাজ্য দেশকে অবর্ণনীয় ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া মাত্র প্রতিনিয়ত সেই সরকারের মন্ত্রী এমপি-দের অপকর্ম ছাপা হয়েছে পত্রিকায়; কারো কারো সম্পদ বাজেয়াপ্ত থেকে কয়েদী মেয়াদও নির্ধারণ হয়েছে ইতিমধ্যে। ঐ জোট সরকারের বিএনপি-জামায়াত ক্যাডাররা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বানিজ্য কুক্ষিগত করে নেয়। বিদেশে পাচার করা অর্থে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছে হাওয়া ভবনের মদদ পুষ্টরা। প্রশাসনকে করেছে জিম্মি শামিল। এই সব কারনে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর অভিযোগ ছিল অতি প্রত্যাশিত ঘটনা। কিন্তু অভিযুক্তদের দু-চার জনকে গ্রেফতার করা এবং কেবল মাত্র চাঁদাবাজির মামলায় দুদকের স্বচ্ছতার প্রমান মেলেনি। যাদের বিরুদ্ধে সুনিদিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, এমন অভিযুক্তদের তথাকথিত সংস্কারের অবয়বে অভিযুক্ত না করায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আসল উদ্দেশ্যটি ফাঁস হয়ে গেছে। সরকারের সেই উদ্দেশ্যটির ঘোমটা উন্মোচন করেছেন স্বয়ং যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ আবদুল মতিন এবং তথ্য ও আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন। তারা যথাক্রমে বলেছেন, জামাতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই এবং "মুজাহিদ"-কে তিনি চিনেন না; আর সব শেষ বলেছেন, এই সরকার ব্যর্থও হতে পারে, সে জন্য দায়ভার গড়াবে সুশীল ও মিডিয়া সমাজের ওপর।

বাস্তবিক অর্থে, এই সরকারের আসল লক্ষ্যটি দুর্নীতি উচ্ছেদ বা সংস্কার নয়। তাদের প্রধান লক্ষ্য আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা। বাম দল, মৌলবাদ বা সংস্কারবাদের নামে বাংলাদেশে আসলে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি গড়ে ওঠেছে বহু। অনেকেই বিগত সরকারের দুঃশাসনে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও সুযোগ বুঝে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। সেনা প্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনকের স্বীকৃতি দেবার পর পরই আমলারা নতুন ফর্মূলা তৈরি করেছে - বঙ্গবন্ধুকে দেশের স্থপতি বানানো যেতে পারে তবে জাতির

পিতা নয়। কারন বাঙালী জাতির ইতিহাস হাজার বছরের; সে জন্য জেনারেল মইনের আবেদনটি বদলে গিয়ে পাঠ্য পুস্তকে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে যথাযোগ্য মর্যাদায় দেয়ার প্রস্তাব এসেছে।

বিএনপি-জামায়াতের লুটপাট আর দুঃশাসনের কারনে সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এমনই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে উদ্ধারের আর কোন পথই খোলা ছিল না। অন্যদিকে নিরপেক্ষ জনসমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাক, সরকার তা চায় না। বিএনপি-র প্রতি রুষ্ট এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোও তা চায় না। দেশের এক শ্রেনীর সুবিধাবাদী মানুষ (এলিট হিসেবে বিবেচিত) সততা ও নিরপেক্ষতার ফুলজুড়ি ছাড়লেও "আওয়ামী লীগ ঠেকাও" আন্দোলনে প্রকারান্তরে ঐক্যবদ্ধ। সে কারনে মূল আক্রমণ এখন আওয়ামী লীগেরর ওপর। এর কারনও বহু।

প্রথমতঃ আওয়ামী লীগ সব চাইতে পুরনো দল। এর সাংগঠনিক ভিত্তি সব শ্রেনীতে সর্বত্র। বহু বিভক্তি আর নির্যাতনের পরও আজও দলটি একক সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সহ সকল আন্দোলনের ধারক ও বাহক এবং যতবার সরকার গঠন করেছে গণতান্ত্রিক ও সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের রায়েই তা করেছে। কারো সাথে গোপন আতাত বা সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় ক্ষমতাসীন হয়নি। তৃতীয়তঃ দলটি বারংবার সংস্কারমুখি হয়েছে, নতুন নেতৃত্ব উপহার দিয়েছে এবং নীতি বিসর্জন দিয়ে জনতার সাথে বেঈমানি করেনি, এমনকি নেতৃত্বের ভুল-ত্রুটি সত্বেও জাতির জন্য ভয়াবহ সর্বনাশ ডেকে আনেনি। এবং চতুর্থতঃ দেশে এখন গণতন্ত্র নিয়ে মাতম ওঠেছে, অথচ আওয়ামী লীগই স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংযোজন করেছে। এখন বিশ্বজুড়ে মানুষ যখন মৌলবাদ ও ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে সোচ্চার, আওয়ামী লীগই ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে সে বিধানটি সংযোজিত করে।

তথাপি পচাত্তর পরবর্তী বছর গুলোতে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের কোন্দলের কারনে দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। নিহত জাতীয় নেতৃত্বের অবর্তমানে বিভ্রান্ত দলছুট নেতারা অন্য দলে যোগ দিয়ে নতুন দল গঠনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় দলের বিশাল কর্মীবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ডাক পড়েছিল শেখ হাসিনার। বিদেশ থেকে আসা শেখ হাসিনা দলের সেই সংকটকালে নেতৃত্বভার হাতে নেন এবং সহসাই জননেত্রীর মর্যাদায় সমাসীন হন। দলকে পুর্নগঠন ছাড়াও সফল নেতৃত্ব ও ক্রমাগত আন্দোলনের মাধ্যমে দলকে ক্ষমতাসীন করতে সমর্থ হন এবং পাঁচ বছর সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। দলের বাইরে থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ-কে দেশের রাষ্ট্রপতি করেছেন। সর্বশেষ তিনি দলের কাউন্সিলে যুব নেতৃত্বকে জাতীয় কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। তার এ সব সাহসী, গণতান্ত্রিক ও উদার নেতৃত্বগুণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তার পরও বিভিন্ন কারনে দলের শীর্ষ নেতৃত্বে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। কতিপয় নেতা নিজেরা দলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 'পক্ষ বাহিনী' গড়েছেন গোপনে। আজকে তারাই ছদ্মবেশী সামরিক সরকারের আস্কারায় 'অভিনব সংস্কারের' দাবি তুলছেন। এই তথাকথিত সংস্কারবাদীরা আওয়ামী বিরোধী পক্ষ শক্তির হয়ে নিজ গৃহে আগুন দেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে এটা আজ অমূলক নয় যে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে ধ্বংস করাই বিরোধী বলয়ের একমাত্র ব্রতে পরিনত হয়েছে। পরিকল্পিত পন্থায় একের পর এক মামলা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তন্মধ্যে প্রধান নেত্রী শেখ হাসিনা হয়েছেন শীর্ষ টার্গেট। কারন শেখ হাসিনা বর্তমান সরকারের অবৈধ আচরন, সাংবিধানিক সময় সীমা লংঘন এবং ক্ষমতার উদ্দেশ্যকে উন্মোচন করে দিয়েছেন। সরকারের সংশয় ছিল এ ধারা অব্যাহত থাকলে তিনি জনতাকে রাস্তায় নামার ডাক দেবেন। যদিও গ্রেফতারের পূর্ব মুহুর্তে লেখা চিঠিতে সে ইঙ্গিতটি জাতিকে দিতে তিনি পিছপা হননি। গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতি সে আবাহনটিই তিনি রেখেছেন। লক্ষ্য করুন, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের আগেই কেন্দ্রীয় নেতাদের কৌশলে প্রতিবাদী বানিয়েছে সরকার। অথচ দেশ জুড়ে বিপুল কর্মী বাহিনীর কাছে সাড়া না পেয়ে এই বিরোধীরা দেশান্তরী অথবা নিষ্ক্রিয় হচ্ছেন। বয়সের ভারে ন্যূজ্ব জিল্লুর রহমান-ই নেতৃত্বের দায়ভার হাতে নিয়েছেন। আওয়ামী লীগকে দুর্বল করে দিয়ে সরকার স্বেচ্ছাচারি কায়দায় প্রভূ রাষ্ট্রের মোড়ককে দেখানো নির্বাচনের উদ্যোগ নেবে এবং সব ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে একটি পুতুল সরকার বা পাপেট পার্লামেন্ট গড়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশ পরিচালনা করবে। বর্তমান সরকারের কার্যকলাপ এবং উপদেষ্টাদের বক্তব্য থেকে সে কথাই এখন সুস্পষ্ট। তবু মানতে হবে এটা বাংলাদেশ। সাধারন রাজনীতি ও বাংলাদেশের রাজনীতি যে এক নয়, আর রহস্য ঘেরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গতি-প্রকৃতির শেষ কোথায় তা নির্ধারণ হবে খুব সহসাই। দেখার অপেক্ষায় আছি।

লেখকঃ কানাডা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক।
ই-মেইলঃ **anshassworld@yahoo.ca**